অণুকথা সপ্তক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

"ভারতী ভবন"
১১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা,
১৩৪৬।

প্রকাশক—শ্রীকুন্দ ভাদুড়ী
"ভারতী ভবন"
১১, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শীল কর্ত্তৃক শ্রীভারতী প্রেস, ১৭০, মানিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

করকমলেষু....

আমার কল্পিত এই "অণুকথা সপ্তক" তোমার হাতে সাদরে তুলে দিচ্ছি এই ভরসায় যে এই ক্ষুদ্র উপহার নগণ্য বলে তোমার কাছে উপেক্ষিত হবে না। কেননা আমার লেখা তোমার চিরকালই ভাল লাগে, তা সে রচনা প্রবন্ধই হোক আর গল্পই হোক।

এই গল্পগুলি সবই ছোট্ট গল্প। ছোট্ট গল্পের সংস্কৃত নাম আমি জানিনে,—তাই এদের নাম দিয়েছি—অণুকথা।

এই সব একরত্তি কথার ভিতর কোন বড় কথা নেই তা-সত্ত্বেও এদের অন্তরে যদি কিছু গুণ থাকে ত, তা তোমার মত সহৃদয় হৃদয়বেদ্য।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

মন্ত্রশক্তি

(১)

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না ;—কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে, শাস্ত্র পড়ে' নয়,—মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে'।

চোখে কি দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়েছিলুম চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পূব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সুমুখে। পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ীর দাসী-চাকরাণীরা কখনো কখনো রাত দুপুরে পেতেন,—ধোঁয়ার মত যাঁর ধড়—আর কুয়াসার মত যাঁর জটা। আর দক্ষিণে পূজোর আঙিনা—যে আঙিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল বলে' একটি কবন্ধ জন্মেছিল। এঁকে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দি সর্দ্দার, তাঁর সৈন্য-সামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে তারই ব্যবস্থা করছিলেন। কি চেহারা তাঁর! গৌরবর্ণ, মাথায় ছ-ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁফ-ছাঁটা। সে ছিল ও-দিগরের সব-সেরা লকড়িওয়ালা।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন—"ঈশ্বর পাটনিকে এক হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি কি লাঠি, কি লক্‌ড়ি, কি সড়কি—ও হাতে নিলে কোন লেঠেলই ওর স্থমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম করলে, ও না বলতে পারবে না, কারণ ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।"

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাস,—চর্ব্বি এক বিন্দুও নেই। রঙ তার কালো অথচ দেখতে স্থপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, "আজ তোমাকে এক হাত খেলা দেখাতে হবে।"

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, "হুজুর, লেঠেলি আমার জাত-ব্যবসা নয়। বাপ ঠাকুরদার মত আমিও খেয়ার নৌকো পারাপার করেই দু'-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠি খেলা নয়, লগি ঠেলা। তাই বলছি হুজুর, এ আদেশ আমাকে করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তাহ'লে, তুমি লাঠি খেলতে জানো না?"

(২)

সে উত্তর করলে, "হুজুর, জানতুম ছোকরা বয়সে, তারপর আজ বিশ-পাঁচিশ বছর লাঠিও ধরিনি, লক্‌ড়িও ধরিনি, সড়কিও

ধরিনি ; তা ছাড়া—আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি করে' ? হুজুরের হুকুম হ'লে, আমি না বলতে পারিনে ; কিন্তু হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন, তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কেন এরকম দিব্যি করেছিলে ?'

ঈশ্বর বললে, 'ছেলেবেলায় এরা সব খেলা শিখতো। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লক্‌ড়ি, কি সড়কিতে—আমিই হয়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে যে আমি কোনও মন্তর-তন্তর শিখেছি—তারি গুণে আমি সকলকে হঠিয়ে দিই। হুজুর, আমি তন্তর-মন্তর কিছুই জানিনে; তবে আমার যা ছিল, তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিষ হচ্ছে চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে, তার হাতের লাঠি সড়কির মার কোন্ দিক থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারতো না, আর শুধু মার খেতো। শেষটা এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে।

তারপর একদিন এরা রাত দুপুরে আমার বাড়ী চড়াও হয়ে, আমাকে বিছানা থেকে তুলে', আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে', কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে আমাকে বলি দেবার উদ্যোগ করলে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দ্দারের হাতে। আমি

প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বললে, 'তুমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি কর যে আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তাহ'লে তোমাকে ছেড়ে দেব।' হুজুর নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এই দিব্যি করেছি; আর তারপর থেকে একদিনও লাঠি সড়কি ছুঁইনি। কথা সত্যি কি মিথ্যে—ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।

(৩)

মিছু আমাদের বাড়ীর লেঠেলের সর্দ্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে ?—সে 'হাঁ' 'না' কিছুই উত্তর করলে না।

ঈশ্বর এর পর বলে উঠল, "হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলিনি—আর, কখনো বলবও না।"

তারপর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'মিছু যদি গুলিখোর হয় ত এমন পাকা লেঠেল হল কি করে ?'

ঈশ্বর বললে, "হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে ত যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না ? ঠাকুরদাস কামার অত বড় মোষটার মাথা এক কোপে বেমালুম কাটলে; আর ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করিনে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরের জোর এখন কমে এসেছে—যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয়—তাহলে দেখতে পাবেন যে, বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।'

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম তারা ঈশ্বরকে খেলবার অনুমতি দেবে কি না। তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করে' বললে, "আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মত অনুমতি দিচ্ছি। দেখা যাক, ও কি ছেলেখেলা করে।"

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর, ঈশ্বর কোমরের কাপড় তুলে বুকে বাঁধলে, আর তার ঝাঁক্ড়া চুল একমুঠো ধূলো দিয়ে ঘসে' ফুলিয়ে তুললে; তারপর মাটিতে জোড়াসন হয়ে বসে', পাঁচ মিনিট ধরে' বিড় বিড় করে' কি বকতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব চীৎকার করে' উঠল,—"দেখছেন, বেটা মন্তর আওড়াচ্ছে, আমাদের নজরবন্দী করবার জন্যে।" ঈশ্বর এ সব চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করলে না; তারপর যখন সে উঠে দাঁড়ালে, তখন দেখি সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বল্‌ছে আর শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মত।

(৪)

ঈশ্বর বললে, "প্রথম এক হাত লক্‌ড়ি নিয়েই ছেলেখেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লক্‌ড়ি ধরুক।"

মনিরুদ্দি সর্দ্দার বললে, "আমার ছেলে কামালের সঙ্গেই এক হাত খেলে, তাকে যদি হারাতে পার তাহ'লে আমি তোমাকে লক্‌ড়ি খেলা কাকে বলে তা দেখাব।" তার পরে একটি বছর-কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি; বাঁ হাতে তার ছোট্ট একটি বেতের ঢাল আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টুকটুকে

একখানি লক্‌ড়ি। খেলা সুরু হ'ল। এক মিনিটের মধ্যেই দেখি—কামালের লক্‌ড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে, আর কামাল নিরস্ত্র হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বললে, "যে লক্‌ড়ি হাতে ধরে' রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি?" এ কথা শুনে মনিরুদ্দি রেগে আগুন হয়ে লকড়ি-হাতে এগিয়ে এল। ঈশ্বর বললে—"তোমার হাতের লক্‌ড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লক্‌ড়ির দাগ বসিয়ে দেব।" এর পরে পাঁচ মিনিট ধরে' দু'জনের লকড়ি বিদ্যুৎবেগে চলা-ফেরা করতে লাগল। শেষটা মনিরুদ্দির লক্‌ড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল; আর দেখি—মনিরুদ্দির সর্ব্বাঙ্গে লাল লাল দাগ, যেন কেউ সিঁদূর দিয়ে তার গায়ে ডোরা-কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে হেদাৎউল্লা লাফিয়ে উঠে' বললে, "ধর বেটা সড়কি।" ঈশ্বর বললে, "ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিও না। জানি তুমি খুনে। কিন্তু এ ত কাজিয়া নয়—আপোষে খেলা। আর এই কথা মনে রেখ, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তোমার গায়েও আছে।" এর পর সড়কির খেলা সুরু হ'ল। সড়কির সাপের জিভের মত ছোট ছোট ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয়, আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কিরকম করে, কারণ সড়কির ফলা ত সাপের জিভ নয়,-দাঁত। সে যাই হোক, হেদ্যাৎউল্লা হঠাৎ 'বাপ রে' বলে' চীৎকার করে' উঠল।

(৫)

তখন তাকিয়ে দেখি তার কব্জি থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে পড়ে'। ঈশ্বর বললে,—"হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি জখম করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার করে' দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত থেকে খসিয়ে না দিতুম, তাহ'লে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না। ও চায়—হয় জখম করতে, নয় খুন করতে।"

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখে লেঠেলদের মাথায় খুন চড়ে' গেল, আর সমস্বরে 'মার বেটাকে' বলে চীৎকার করে' তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ করলে। ঈশ্বর একখানা বড় লাঠি দু'হাতে ধরে' আত্মরক্ষা করতে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দু'জনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা করতে লাগলুম। হুজুরের হুকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে। তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হয়েছিল; কারও মাথাও ফেটে গিয়েছিল। শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমাকে বললে, "আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি। কাউকেও এক ঘা মারিনি। ওদের গায়ে-মাথায় যে দাগ দেখছেন—সে সব ওদেরই লাঠির দাগ। এলোমেলো লাঠি চালাতে গিয়ে এর লাঠি ওর মাথায় গিয়ে পড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি যে এদের লাঠিবৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি, সে শুধু হুজুরের—ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে।"

মিছু সর্দ্দার বললে, "হুজুর, আগেই বলেছিলুম ও-বেটা যাদু জানে। এখন ত দেখলেন যে, আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে ?"

ঈশ্বর হাতযোড় করে' বললে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানিনে। তবে সড়কি লাঠি ধরবামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই ; যিনি আমার দেহে ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।"

আমি বুঝলুম লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন, তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠি খেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই—যথা, সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে—তিনিই দিগ্বিজয়ী হ'ন, যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কি, যাদের শরীরে তা নেই, তাঁরা জানেন না ; আর যাঁদের শরীরে আছে, তাঁরাও জানেন না।

যখ

শ্রীমান্ অলকচন্দ্র গুপ্ত

কল্যাণীয়েষু

যখ কাকে বলে জানো? সংস্কৃতে যাকে বলতো যক্ষ, তারই বাঙলা অপভ্রংশ হচ্ছে যখ। আমাদের মুখে যে শুধু যক্ষ যখ হয়ে গিয়েছে তাই নয়;—তার রূপগুণও সব বদলে গিয়েছে। সংস্কৃতে যক্ষের রূপ কি ছিল আমি জানিনে। তবে এইমাত্র জানি যে, সে যুগে লোকে তাদের ভয় করত। কারণ তাদের শক্তি ছিল অসীম, অবশ্য মানুষের তুলনায়। আর যার শক্তি বেশী, তাকেই লোকে ভয় করে। যক্ষরা ছিল মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি এক শ্রেণীর অদ্ভুত জীব; এক কথায়, তারা ছিল অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক পশু। তাদের একটি গুণের কথা সকলেই জানে। তারা ছিল সব ধনরক্ষক। তাই যক্ষের ধন কথাটা এদেশে মুখে মুখে চলে গিয়েছে।

বাঙলাদেশে যক্ষ জন্মায় না। তাই যখ লোকে বানায়,—ধনের রক্ষক হিসেবে। ধন সকলেই অর্জ্জন করতে চায়, কিন্তু কেউ কেউ অর্জ্জিত ধন রক্ষা করতে চায় চিরদিনের জন্য। এক কথায় ধনকে অক্ষয় করতে চায়। মানুষ চিরকালের জন্য দেহকেও রক্ষা করতে পারে না, ধনকেও নয়। যা অসম্ভব তাকে

সম্ভব করাই হচ্ছে বাঙলায় যখ স্থষ্টির উদ্দেশ্য। এ দেশের কোটি-পতিরা কি উপায়ে যখ স্থষ্টি করতেন জানো ?

তাঁরা সোনার মোহর ভর্ত্তি বড় বড় তামার ঘড়া আর সেই সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ বালককেও একটি লোহার কুঠরিতে বন্ধ করে দিতেন। বালক বেচারা যখন না খেতে পেয়ে মরে যেত, তখন সে যখ হ'ত আর কোটিপতির সঞ্চিত ধন রক্ষা করত। ধন আজও লোকে রক্ষা করে। শুনতে পাই Bank of Franceএ কোটি কোটি মোহর মজুত রয়েছে, আর তার রক্ষার জন্য বিজ্ঞানের চরম কৌশলে তালাচাবি তৈরী করা হয়েছে ; আর সে ধনাগার রয়েছে পাতালে। এর কারণ বেচারা ফরাসীরা যখ দেওয়া রূপ সহজ উপায়টি জানে না।

আমি একবার একটি যখ দেখেছিলুম—কোথায়, কখন, কি অবস্থায়, তার ইতিবৃত্ত একটা গল্প আকারে প্রকাশ করেছি। সে গল্পটি শুনলে, গ্রীক আলঙ্কারিক আরিস্টটেল বলতেন যে সেটি একটি কাব্য, কেননা তার অন্তরে আছে স্থধু terror and pity। অবশ্য বাঙলাদেশের কাব্য সমালোচকদের মত সম্পূর্ণ আলাদা। এর কারণ বাঙালীরা গ্রীক নয়, আর গ্রীক হতেও চায় না ; হতে চায় ইংরেজ। সে যাই হোক, আমার আহুতি নামক সে গল্পটি সম্বন্ধে বাঙালী সমালোচকের মত কি, তা শুনে তোমাদের কোনও লাভ নেই—কেননা সে গল্পটি তোমাদের পড়তে আমি অনুরোধ করব না। সেটি ছোট ছেলের গল্প হলেও ছোট ছেলেদের পাঠ্য নয়।

আজ যে যখের গল্পটি তোমাকে বলব, সে গল্প আমি শুনেছি পরের মুখে; আর এ গল্পটির ভিতর আর যাই থাক্, পিলে-চম্‌কানো ভয় নেই।

আমি নিজে পথিমধ্যে যখ দেখে এতটা ভয় পাই যে যখন বাড়ী গিয়ে উঠলুম, তখন আমার দেহের উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রিতে উঠে গিয়েছে। একে জ্যৈষ্ঠ মাস, আকাশে হচ্ছে অগ্নিবৃষ্টি, তার উপর ম্যালেরিয়ার দেশ, তার উপর মনের উপর বিভীষিকার প্রচণ্ড ধাক্কা,—এই সব মিলে আমার নাড়ীকে যে ঘোড়দৌড় করাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—বাড়ী গিয়েই বিছানা নিলুম, আর সাতদিন সেখান থেকে নড়িনি। আমার চিকিৎসার ভার নিলেন জনৈক পাড়াগাঁয়ে কবিরাজ। তাঁর ওষুধ হ'ল দুটি,—লঙ্ঘন আর পাঁচন। সে পাঁচন যেমন সবুজ তেমনি তিতো। লঙ্ঘনের চোটে ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করত; তাই সেই পাঁচন ওষুধ হিসেবে নয়, রোগীর পথ্য হিসাবে গলাধঃকরণ করতুম। আমার বিছানার পাশে সমস্ত দিন হাজির থাক্‌তেন রমা ঠাকুর। আর এই শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁরই মুখে এ গল্প শুনেছি।

আগে দু'কথায় রমা ঠাকুরের পরিচয় দিই; কারণ তিনি ছিলেন যেমন গরিব, তেমনি ভাল লোক। তাঁর পুরো নাম—রমাকান্ত নিয়োগী ঠাকুর। এঁরই পূর্ব্বপুরুষরা পূর্ব্বে আমাদের গ্রামের মালিক ছিলেন। পরে নিয়োগী বংশ ধনেপ্রাণে ধ্বংস হয়। শেষটা এঁদের মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন একমাত্র রমা ঠাকুর। তিনি একা বাস করতেন একখানি খড়ো ঘরে। কখনও বিবাহ

করেন নি, ফলে তাঁর ঘরে আর দ্বিতীয় লোক ছিল না। তিনি অবশেষে হয়েছিলেন আমাদের কুলদেবতার পূজারী। আমাদের কুলদেবতা 'শ্যামসুন্দর' ছিলেন জঙ্গমঠাকুর—কোন শরিকের বাড়ী পালাক্রমে থাকতেন দুদিন, কোনও বাড়ীতে বা তিন দিন। ঠাকুরের ভোগ খেয়ে ও দক্ষিণা নিয়েই তাঁর অন্নবস্ত্রের সংস্থান হ'ত; আর উপরি সময় তিনি পাঁচজনের শুশ্রূষা করতেন। লোকটি আকারে ছোটখাট; তাঁর বর্ণ শ্যাম, আর মাথার চুল একদম সাদা। এমন নিরীহ, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক হাজারে একটি দেখা যায় না। তাঁর নিজের কোনও কাজ ছিল না। কিন্তু পরের অনেক ফাইফরমাস খেটে তিনি হাঁপ জিরবার সময় পেতেন না।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে রমা ঠাকুরকে আমার যখ দর্শনের গল্প বললুম। তিনি সে গল্প শুনে আমাকে ভরসা দিলেন যে কিছু ভয় নেই, তুমি দুদিনেই ভাল হয়ে উঠবে। যখ তোমার আমার মত লোকের হন্তারক নয়। তবে আমার গল্প তিনি সত্য বলেই মেনে নিলেন; কেননা রমা ঠাকুরও একবার দিন-দুপুরে নয়, রাতদুপুরে যখ দেখেছিলেন। আর তিনি যে জলজ্যান্ত যখ দেখেছিলেন, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। তিনি ইংরাজী পড়েন নি, সুতরাং যা দেখতেন, যা শুনতেন তাতেই বিশ্বাস করতেন। আমার কথা আলাদা। আমি ইংরেজী পড়েছি, সুতরাং যা দেখিশুনি তাতে বিশ্বাস করিনে। আমার থেকে থেকেই মনে হত যে,

আমি যখ টখ্ কিছুই দেখিনি ; পাল্কির ভিতর হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম। ওষুধই যে শুধু স্বপ্নলব্ধ হয় তা নয়; কখনো কখনো স্বপ্নলব্ধ গল্পকবিতাও পাওয়া যায়। তা যে হয়, তা ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস পড়লেই জানতে পাবে। এখন নিয়োগী ঠাকুরের গল্প শোনো। শুনতে কিছু কষ্ট হবে না, কেননা গল্পটি এত ছোট্ট যে, একটী ছোট এলাচের খোসার ভিতর তাকে পোরা যায়। রমা ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নন্দীগ্রাম কোথায় জানেন ?—আমি বললুম, না।

তিনি বললেন—

তা জানবেন কি করে ? আপনি দু-পাঁচ বছরে একবার বাড়ী আসেন, আর দু-পাঁচদিন থেকেই চলে যান। নন্দীগ্রাম এখান থেকে দু'-পা। এই দক্ষিণের বিলটে পেরিয়ে তারপর মাঠটার ওপারে বাঁয়ে ভেঙ্গে যে পথটা পাওয়া যায়, সেই পথটায় কিছুদূর গেলেই নন্দীগ্রামে পৌঁছান যায়। এখান থেকে মাত্র পাঁচক্রোশ রাস্তা।

বছর তিনেক আগে আমার একবার নন্দীগ্রামে যাবার দরকার ছিল। দরকার আর কিছুই নয়,—সেখানে গেলে খালি হাতে আর ফিরতে হত না। সে গ্রামের অধিকারীবাবুরা দেব-দ্বিজে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, যদিচ তাঁরাও ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের দ্বারস্থ হলে টাকাটা সিকেটা মিলত।

আমি স্থির করলুম কোজাগর পূর্ণিমার রাতে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন ত সিদ্ধি খেতেই হয়, আর সমস্ত রাত জাগতেও হয়। তাই

মনে করলুম যে, ঘরে বসে রাত জাগার চাইতে এক ঘটি সিদ্ধি খেয়ে রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়ব—আর হেঁসে-খেলে পাঁচ ক্রোশ পথ চলে যাব। রাত এগারটায় বেরলেও ভোর হতে না হতে নন্দীগ্রাম গিয়ে পোঁছব।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—

"রাত্তিরে একা এই বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে ভয় করল না?" তিনি হেসে উত্তর করলেন—

"ভয় কিসের, চোর ডাকাতের? জানেন না, লেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। চোর ডাকাত আমার নেবে কি? গলার তুলসি কাঠের মালা, না গায়ের নামাবলী? তা ছাড়া এ অঞ্চলে যারা ডাকাতি করে, তারা সব আপনাদেরই মাইনেকরা লেঠেল। তারা আমাকে ছোঁবে না, সঙ্গে হীরাজহরৎ থাকলেও নয়। ভয় অবশ্য বাঘের আছে। কিন্তু তারাও আমাদের মত গরীব ব্রাহ্মণদের ছোঁয় না। আমাদের শরীরে আছে হাড় আর চামড়া আর দু-তিন ছটাক রক্ত, কিন্তু রস একেবারেই নেই। বাঘরাও মানুষ চেনে, অর্থাৎ কে খাদ্য আর কে অখাদ্য। সে যাই হোক, রাত এগারটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লুম। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খঞ্জনার ধারে গিয়ে পড়লুম। খঞ্জনা কখনো দেখেছেন? চমৎকার নদী। রসি দু-তিনের চাইতে বেশি চওড়া নয়—কিন্তু বারোমাস তাতে জল থাকে, আর সে জল বারোমাস টল্‌টল্‌ করছে, তক্ তক্ করছে। এই খঞ্জনার ধার দিয়েই সোজা নন্দীগ্রাম যেতে হয়।

কোজাগর পূর্ণিমার রাত, চাঁদের আলোয় গাছপালা সব হাসছে, আর আলোকলতায় ছাওয়া কুলের গাছগুলো দেখতে মনে হচ্ছে যেন সব সোনার তারে জড়ানো। আমি মহা ফূর্ত্তি করে চলেছি, ক্রমে পালপাড়ার সুমুখে গিয়ে উঠলুম। পালপাড়া বলে এখন কোনও গ্রাম নেই, কিন্তু তার নাম আছে। সমস্ত গ্রাম বনজঙ্গলে গ্রাস করেছে। সুধু এ গ্রামের সেকালের ধনকুবের সনাতন পালের আধক্রোশজোড়া ভাঙ্গা বাড়ী পালদের উড়ে-যাওয়া টাকার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এমন সময় নদীর মধ্যে থেকে একটি গানের সুর আমার কানে এল। গানের সুর বোধহয় ভাটিয়ালী। বাঁশীর মত মিষ্টি তার আওয়াজ। সে গান শোনবামাত্র মন উদাস হয়ে যায়, আর চোখে আপনা হতেই জল আসে। জীবনের যত আক্ষেপ যেন সে গানের মধ্যে আছে।

একটু পরে দেখি—পাঁচটা তামার ঘড়া উজান বেয়ে ভেসে আসছে, আর তার উপরে একটা ছেলে জোড়াসন হয়ে বসে গান করছে। সে যেন সাক্ষাৎ দেব-পুত্র। ধবধবে তার রঙ, কুঁদে কাটা তার মুখ, পায়ে তার সোনার মল, হাতে সোনার বালা ও বাজু, গলায় সাতনলী হার। বুকে ঝুলছে সোনার পৈতে। পরণে রক্তের মত লাল চেলি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। একটু লক্ষ্য করে দেখলুম, যা তার সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তা সোনার অলঙ্কার নয়—সোনার সাপ। আর সেই দেব-বালকের কোলে রয়েছে একটি ছোট ছেলের কঙ্কাল। তখন বুঝলুম এটি

হচ্ছে একটি যখ। আর মনে পড়ল ছেলেবেলায় শুনেছিলুম যে, পরম বৈষ্ণব সনাতন পাল একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে যখ দিয়েছিলেন, সে তাঁর ধন রক্ষা করেছিল কিন্তু তাঁর বংশ নির্ব্বংশ করেছিল।

আমি সনাতন পালের পোড়ো-বাড়ীর সুমুখে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে-- এই দিব্য-মূর্ত্তি দেখ্‌ছিলুম আর একমনে এই পাগলকরা গান শুনছিলুম। হঠাৎ কোথেকে কষ্টিপাথরের মত কালো একটুকরা মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে। অমনি চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এই ঘোর অন্ধকারে সেই সব তামার ঘড়া আর সেই দেব-বালক অদৃশ্য হয়ে গেল—আর তার গানের সুরও আস্তে আস্তে আকাশে মিলিয়ে গেল। অমনি সেই মেঘও কেটে গেল আর দিনের আলোর মত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গাছপালা সব আবার হেসে উঠল।

তখন দেখি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, যেন আমার রক্ত-মাংসের শরীর পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

খানিকক্ষণ পরে আমার দেহ মন ফিরে এলো। আর নিশিতে পাওয়া লোক যে ভাবে হাঁটে সেই ভাবে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে সূর্য্য ওঠবার আগে নন্দীগ্রামে গিয়ে পোঁছলুম।

কিন্তু এই যখ দেখার কথা কাউকেও বলি নি। কারণ এ কথা মুখে মুখে প্রচার হলে, হাজার লোক খঞ্জনায় নেমে পড়ত, ঐ তামার ঘড়ার তল্লাসে। অবশ্যই তাতে সব ঘড়া ডুবুরীরা উপরে তুলতে

পারত না—মধ্যে থেকে তারা খঞ্জনার ফটিক জল শুধু ঘুলিয়ে দিত। আর যদি তারা সেই মোহর-ভরা ঘড়া তুলতেই পারত, তাহলে আরও সর্ব্বনাশ হত। কারণ ঐ সব ঘড়ায় পোরা প্রতি মোহরটি সোনার সাপ হয়ে গিয়েছিল। সে সাপ যখের গায়ে গহনা, কিন্তু মানুষে ছোঁবামাত্র মারা যায়।

রমা ঠাকুরের গল্পও শেষ হল, আর পিসিমা এক বাটী পাচন নিয়ে এসে হাজির হলেন। এ গল্প যেমন শুনেছি তেমনি লিখছি। আশা করি এই পাড়াগেঁয়ে গল্প তোমাদের কাছে পাড়াগেঁয়ে কবি-রাজী পাঁচনের মত বিস্বাদ লাগবে না।

———

ঝোট্টন ও লোট্টন

[১]

যে কালের কথা বলছি, তখন আমি বাংলাদেশের কোন একটী সহরে বাস করতুম,—কলকাতায় নয়।

পাড়াগাঁয়ে সহরের নানা অভাব থাকতে পারে, কিন্তু একটা জিনিষের অভাব নেই—অর্থাৎ জমির। সহরের ভিতরে না হোক বাইরে দেদার জমি পড়ে আছে,—জঙ্গল নয়, ধানের ক্ষেত। আর সেই সব ধান-ক্ষেতকে কেউ কেউ প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা বাড়ীতে পরিণত করেছেন। আমি যে বাড়ীতে বাস করতুম, সেটা ছিল সেই জাতের বাড়ী।

সে বাড়ীতে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি-গোছ একটা মস্ত আস্তাবল ছিল,—বসতবাড়ীর গা ঘেঁসে নয়, দু'তিন রসি তফাতে বড় রাস্তার ধারে। সে আস্তাবলে ছিল মস্ত একটা গাড়ি-খানা, তার দু'পাশে দু'টি ঘোড়ার থান, আর তার ওপাশে সইস-কোচমানদের সপরিবারে থাকবার ঘর। আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন সেখানে গাড়িও ছিলনা ঘোড়াও ছিল না, মানুষও থাকত না। ছিল শুধু ইঁদুর ও ছুঁচো, টিকটিকি ও আরসোলা; আর সেখানে যাতায়াত করত গো-সাপ ঢোঁড়াসাপ আর গিরগিটি, যাদের দেখবামাত্র আমাদের নীরব ও নিরীহ বিলিতী শিকারী

কুকুরটা তন্মুহূর্ত্তে বধ করত; অথচ তাদের মাংস খেত না। সে ছিল ইংরেজরা যাকে বলে real sportsman। "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,"—এ উপদেশ তাকে দেওয়া ছিল নিষ্প্রয়োজন; কারণ ফলনিরপেক্ষ হত্যাই ছিল তার স্বধর্ম্ম।

[২]

একদিন সকালে আমাদের বাড়ীর বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলুম সেই পোড়ো আস্তাবলে কে মহা চীৎকার করছে। কানে এল আমাদের মালী চিনিবাসের গলার আওয়াজ। সে তারস্বরে 'নিকালো নিকালো' বলে চেঁচাচ্ছে। বুঝলুম যার প্রতি এ আদেশ হচ্ছে, সে পশু নয়—মানুষ।

এই গোলমাল শুনে আমি ও আমার এক আত্মীয় উপেনদাদা দুজনে সেখানে ছুটে গেলুম। গিয়ে দেখি আস্তাবলে গাড়িখানার মেঝেয় দুটি লোক বসে আছে। দুজনেই সমান অস্থিচর্ম্মসার, আর দুজনেই মুমূর্ষু। রোগেই হোক, উপবাসেই হোক, তারা শুকিয়ে মুকিয়ে আমচূর হয়ে গেছে। তারা যে চিনিবাসের কথা অমান্য করছে, তার কারণ তাদের নড়বার চড়বার শক্তি নেই। এমন কঙ্কালসার মানুষ জীবনে আর কখনো দেখিনি। তারা যে এখানে চলে এল কি করে, তা' বুঝতে পারলুম না। বোধহয় আকাশ থেকে পড়েছিল।

উপেনদা এদের দেখবামাত্র চিনিবাসের সঙ্গে যোগ দিয়ে "বেরিয়ে যাও" বলে চীৎকার করতে লাগলেন। আমি ও-

দুজনকেই থামালুম। আমি মনিব, সুতরাং আমি এক ধমক দিতেই চিনিবাস চুপ করলে। আর যদিও আমি তখন 4th Class-এ পড়ি, আর উপেনদা বি.এ. পড়েন, তবু তিনি জানতেন যে মা আমার কথা শোনেন, তাঁর কথা উপেক্ষা করেন। তিনি ভাবতেন তার কারণ অন্ধ মাতৃস্নেহ, কিন্তু আসলে তা' নয়। তার যথার্থ কারণ, মা ও আমি উভয়েই এক প্রকৃতির লোক ছিলুম। অপর পক্ষে উপেনদার মতে, নিজের তিলমাত্র অসুবিধে করে' অপরের জন্য কিছু করা অশিক্ষিত নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ।

সে যাই হোক, আগন্তুক দুটিকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম যে, তারা দুজনে 'দেশ্‌কা' ভাই। কিন্তু কোন দেশ যে তাদের দেশ, তা' তারা বলতে পারে না; কারণ তাদের নাকি "কুছ্‌ ইয়াদ নেই"। তাদের আছে শুধু পেটে ক্ষিধে আর মনে বেঁচে থাকবার ইচ্ছে। তারা আসছে বহুদূর থেকে, আর দু'দিন আমাদের এখানে থাকতে চায়। আর তাদের নাম ঝোট্টন ও লোট্টন। আমি সব দেখে-শুনে বল্লুম—"আচ্ছা, তুম-লোক হিঁয়া রহেনে সক্‌তা"। তারপর মার কাছে গিয়ে তাঁর অনুমতি নিলুম। উপেনদা মাকে ভয় দেখালেন যে ও-দুজন ডাকাত, আর এসেছে আমাদের বাড়ী লুটে নিয়ে যেতে। মা হেসে বল্লেন—"যেরকম শুনছি তাতে ওরা ভূত হতে পারে, কিন্তু ডাকাত কিছুতেই নয়।"

[৩]

ফলে ঝোট্টন ও লোট্টন আমাদের আস্তাবলেই থেকে গেল। মা ওদের দুবেলা খাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন ও দুদিন পরে

ডাক্তার বাবুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বল্লেন এদের চিকিৎসা করতে অনেকদিন লাগবে, তাই হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। চিনিবাস পরদিনই তাদের দুজনের হাত ধরে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল। কিন্তু হাঁসপাতাল তখন ভর্ত্তি, তাই সেখানে তাদের স্থান হল না। হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবু চিনিবাসকে বল্লেন—রোজ সকালে একবার করে এদের নিয়ে এস, নিত্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেব। ঝোট্টুন রোজ যেতে রাজি হল, কিন্তু লোট্টুন বল্লে সে রোজ অতদূর হাঁটতে পারবে না। চিনিবাস তখন প্রস্তাব করলে যে, সে লোট্টুনকে পিঠে করে রোজ হাঁসপাতালে নিয়ে যাবে ও ফিরিয়ে আনবে। আর বাস্তবিকই দিন পোনেরো ধরে সে তাই করলে। লোট্টুন দু'পা দিয়ে চিনিবাসের কোমর জড়িয়ে ধরত, আর দু'হাত দিয়ে তার গলা। চিনিবাসের এই কার্য্য দেখে আমরা সকলেই অবাক হতুম! মা বলতেন—চিনিবাস মানুষ নয়, দেবতা।

এত করেও কিছু হল না। লোট্টুন একদিন রাত্রে শুয়ে সকালে আর উঠল না। চিনিবাসই তার সৎকারের সব ব্যবস্থা করলে। লোট্টুনকে মাদুরে জড়িয়ে একটা বাঁশে ঝুলিয়ে, সে পোড়াতে নিয়ে গেল; একা নয়, আর জন তিনেক জাতভাই জুটিয়ে। মা তার খরচ দিলেন এবং চিনিবাসকে ভাল করে বক্‌শিস্ দেবেন স্থির করলেন। কিন্তু এ বিষয়েও উপেনদা তাঁর আপত্তি জানালেন। তাঁর কথা এই যে, লোট্টুনের সব খাবার চিনিবাস খেত, আর লোট্টুন না খেতে পেয়ে মরে গিয়েছে। মা

জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি চিনিবাসকে লোট্টনের খাবার খেতে দেখেছ ?" তিনি বল্লেন, "না, ঝোট্টনের মুখে শুনেছি।" মা আর কিছু বল্লেন না।

[৪]

তারপর সন্ধ্যেবেলায় চিনিবাস লোট্টনের মুখাগ্নি করে ফিরে এল; এসে ঝোট্টনের সঙ্গে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। চিনিবাসের চীৎকার শুনে আমি আর উপেনদা আস্তাবলে গেলুম। গিয়ে দেখি চিনিবাস এক একবার তেড়ে তেড়ে ঝোট্টনকে মারতে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। তার চেহারা ও রকম-সকম দেখে মনে হল, চিনিবাস শ্মশান থেকে ফেরবার পথে তাড়ি খেয়ে এসেছে। শেষটা বুঝলুম যে ব্যাপার তা নয়। লোট্টনের ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, তাই নিয়ে হচ্ছে ঝগড়া। ঝোট্টন বলছে যে, সে যখন লোট্টনের ভাই, তখন সে-ই ওয়ারিশ। আর চিনিবাস বলছে যে, লোট্টন মরবার আগে তাকে বলে গিয়েছিল যে,—আমার যা কিছু আছে তা তোমাকে দিয়ে গেলুম।

লোট্টনের থাকবার ভিতর ছিল একখানি কম্বল আর একটি লোটা। ঝোট্টন কম্বল দিতে রাজি ছিল, কিন্তু লোটাটি কিছুতেই দেবে না বল্লে। কম্বলটি বেজায় ছেঁড়াখোঁড়া, তবে লোটাটা ছিল ভাল। আমি ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে গেলুম। তবে এ মামলার বিচারটা একদিনের জন্য মুলতবি রাখলুম।

[৫]

তার পরদিন সকালে চিনিবাস এসে বল্লে যে, কাল রাত্তিরে ঝোট্টন লোটাটা নিয়ে ভেগেছে, আর ফেলে গিয়েছে সেই ছেঁড়া কম্বলখানা। চিনিবাস রাগের মাথায় আরও বল্লে "ও শালা চোর হ্যায়, উস্‌কো রাস্তামে পকড়কে মারকে ও-লোটা হাম লে লেগা।" এ কথায় উপেনদাও রেগে তাঁর হিন্দীতে জবাব দিলেন—"তুমি চোরের উপর বাটপাড়ি করতে গিয়াথা, না পেরে এখন ঝোট্টনকে খুন করতে চাতা হ্যয়। ঐ লোটার লিয়ে তুমি লোটনকো পিঠে করে হাঁসপাতাল যাতা আতা থা। আর তার মরবার পরও লোট্টনের জাতবিচার নেই করকে তার মড়া কাঁধে করেছ। তোমি মানুষ নেহি হ্যয়—পশু হ্যয়।" চিনিবাস জিজ্ঞেস করলে—"মুর্দ্দা কোন জাত হ্যয় বাবুজি ?"

এর পর চিনিবাস ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল—উপেনদার কটু কথা শুনে নয়, হারাধন লোটার দুঃখে। ইতিমধ্যে মা এসে জিজ্ঞেস করলেন—এত দুঃখ কিসের ? চিনিবাস বল্লে—"হমারা জরুকো বোল্‌কে আয়া যো একঠো আচ্ছা লোটা লা দেগা। বেগর লোটা ঘর যানেসে উস্‌কা সাথ লড়াই হোগা। ও ভি হামকো মারেগা, হাম ভি উস্‌কো মারেগা। ওঠো ছোটা জাতকে ওউরৎ হ্যয়, উস্‌কো মারনেসে ও ভাগে গা। তব্ হামারা ভাত কোন পাকায় গা ? হাম ভুক্‌সে মরেগা।"

এ বিপদের কথা শুনে মা বল্লেন—"আমি তোমাকে একটা নতুন ঘটি কিনে দেব।" এ আশা পেয়ে চিনিবাস শান্ত হল।

সমস্যা

এ অকিঞ্চিৎকর ঘটনার গল্প আপনাদের কাছে বলবার উদ্দেশ্য এই যে,—মা বলেছিলেন চিনিবাস মানুষ নয়, দেবতা। আর উপেনদা বলেছিলেন সে মানুষ নয়, পশু। আমি বহুকাল বুঝতে পারিনি, এঁদের কার কথা সত্য। এখন আমার মনে হয় যে, চিনিবাস দেবতাও নয়, পশুও নয়—শুধু মানুষ। যে অর্থে ঝোট্টন লোট্টনও মানুষ, তুমি আমিও মানুষ।

—আপনারা কি বলেন?

মেরি ক্রিস্‌মাস

প্রথম যৌবনে বিলেত গেলে—প্রায় সকলেই loveএ পড়ে। যারা পড়ে না, তারা দেশে ফিরে এসে বড় লোক হয়। আমিও পড়েছিলুম। শিশুদের যেমন হাম একবার না একবার হয়, বিলেত গেলে এদেশী নবকিশোরদেরও তেমনি এ জাতীয় চিত্তবিকার ঘটে।

এরূপ কেন হয়—তার বিচার বিজ্ঞান-শাস্ত্রীরা করুন। আমি শুধু যা হয়, তাই বলছি।

এ ঘটনার কারণ অবশ্যই আছে। আমরা গল্প-লেখকেরা যদি সে কারণের বিষয় বক্তৃতা করি, তাহলে psychology, physiology এবং উক্ত দুই শাস্ত্র ঘেঁটে এক সঙ্গে মিলিয়ে ও ঘুলিয়ে যে শাস্ত্র বানানো হয়েছে—যার নাম sexology—তারও অনধিকার চর্চ্চা করব।

এ সব বিদ্যের পাঁচমিশেলী ভেজাল উপন্যাসে চলে, বিশেষতঃ শেষোক্ত উলঙ্গ শাস্ত্রের; কিন্তু ছোট গল্পে চলে না, কেননা তাতে যথেষ্ট জায়গা নেই।

আমরা বিলেত নামক কামরূপ কামাখ্যায় গিয়ে যে ভেড়া বনে যাই—এ কথা শুনে আশা করি কুমারী পাঠিকারা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। বিলেতী মেয়েরা যে রূপে দেশী মেয়েদের উপর টেক্কা দিতে পারে, তা অবশ্য নয়। রাস্তাঘাটে যাদের দু'বেলা দেখা

যায়, তাদের নিত্য দেখে নারীভক্তি উড়ে যায়। আর তারাই হচ্ছে দলে পুরু। অবশ্য বিলেতে যারা সুন্দরী তারা পরমাসুন্দরী—মানবী নয়, অপ্সরী। সুখের বিষয় এই অপ্সরীদের সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ বাঙ্গালী যুবকদের ঘটে না। আর আমরাও সে দেশে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে উদ্বাহু হইনে।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, অধিকাংশ দেশী যুবক বিলেতে প্রেমে পড়ে। কিন্তু সকলেই আর কিছু বিলেতী মেয়েদের বিয়ে করে না। নভেল-পড়া দেশী মেয়েরা বোধহয় বিশ্বাস করেন যে, মানুষ প্রেমে পড়লেই শেষটা বিয়ে করা স্বাভাবিক। অবশ্য এরকম কোনও বিধির বিধান নেই। প্রেমে পড়াটা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ও হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লক্ষণ। অপর পক্ষে বিবাহটা হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের মূলভিত্তি। লোকে প্রেমে পড়ে অন্তরের ঠেলায়—আর বিয়ে করে বাইরের চাপে। প্রেমের ফুল বিলেতী নভেলে বিবাহের ফলে পরিণত হতে পারে, কিন্তু জীবনে প্রায় হয় না। জীবনটা romance নয়, তাই ত romantic সাহিত্যের এত আদর।

আমি বিলেতে প্রেমে পড়েছিলুম, কিন্তু বিলেতী মেয়েকে বিয়ে করিনি;—করেছি দেশে ফিরে দেশের মেয়েকে, আর নির্ব্বিবাদে সস্ত্রীক সমাজের পিতলের খাঁচায় বাস করছি। কপোত কপোতীর মত মুখে মুখ দিয়েও নয়, ঠোক্‌রাঠুক্‌রি করেও নয়। কিন্তু সেই আদি প্রেমের জের বরাবরই টেনে এনেছি—অন্ততঃ মনে।

জনৈক উর্দ্দু বা ফারসী কবি বলেছেন "উন্‌সে বুতানং বাকী

অস্তু”। অর্থাৎ অন্তরের মনসিজ ভস্ম হয়ে গেলেও, সেই ছাইয়ের অন্তরে কিঞ্চিৎ উষ্ণতা বাকী আছে। আমরা হিন্দুরা হলে বলতুম, দগ্ধসূত্রে সূত্রের সংস্কার থাকে। আমার মনে ঐ জাতীয় একটা ভাব ছিল। কখনো কখনো গোধূলি লগ্নে যখন ঘরে একা বসে থাকতুম, তখন তার ছায়া আমার সুমুখে এসে উপস্থিত হত, তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে যেত। বছর চার পাঁচ আগে শীতকালে বড়দিনের আগের রাতে মনে হল সেই বিলেতী কিশোরীটি আমার শোবার ঘরে লুকোচুরি খেলছে—এই আছে, এই নেই। সমস্ত রাত্রি ঘুম হল না, জেগে স্বপ্ন দেখলুম। স্ত্রীকেও জাগালুম না। সে রাত্তিরে আমার জ্বর হয় নি, কিন্তু বিকার হয়েছিল।

পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠে মনে হল, দেহ ও মন দুই সমান বিগড়ে গেছে, আর বিকারের ঘোর তখনও কাটেনি।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কি অসুখ করেছে?

—কেন?

—তোমাকে ভারি শুক্‌নো দেখাচ্ছে।

—কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় নি বলে।

—তবে কি আজ বেলা সাড়ে নয়টায় থিয়েটারে যাবে?

—যাব। আর বাড়ী ফিরে দুপুরে নিদ্রা দেব।

থিয়েটারে যেতে রাজী হলুম—সে আমার সখের জন্য নয়, স্ত্রীর সখের খাতিরে।

আমরা বেলা সাড়ে নটার সময় চৌরঙ্গীর একটা থিয়েটারে গেলুম,—কলকাতার সৌখীন সাহেব-মেমদের গান শোনবার

জন্য। সে গানবাজনা শুনে মাথা আরও বিগড়ে গেল। একে বিলেতী গানবাজনা, তার উপর সে সঙ্গীত যেমন বেসুরো তেমনি চীৎকারসর্ব্বস্ব। আমি পালাই পালাই করছিলুম। আমার মন বলছিল—ছেড়ে দে মা, হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল আমাদের বাঁ পাশের সারের প্রথম চেয়ারে বসে আছে আমার আদি প্রণয়িনী। এ যে সেই, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। সেই Grecian নাক, সেই violet চোখ। আর সেই ঠোঁট-চাপা হাসি, যার ভিতর আছে শুধু জাদু। একে দেখে আমার মাথা আরও ঘুলিয়ে গেল। আমার মনে হল—এ হচ্ছে optical illusion; গত রাত্তিরের অনিদ্রা, তার উপর এই বিকট সঙ্গীতের ফল। একটু পরে থিয়েটারের পরদা পড়ল—কিছুক্ষণ বাদে উঠবে। অমনি সেই বিলেতী তরুণী উঠে দাঁড়ালেন ও আমাকে চোখ দিয়ে বাইরে যেতে ইঙ্গিত করেলেন। আমিও আমার স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর অনুসরণ করলুম।

বাইরে গিয়ে আমি প্রথমে সিগারেট ধরালুম। তারপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে,

—আমাকে চিনতে পারছ?

—অবশ্য। দেখামাত্রই।

—এতকাল পরে?

—হাঁ। এতকাল পরেও। আমাকে চিনতে পেরেছ?

—তোমার ত বিশেষ কোনও বদল হয় নি। ছিলে ছোকরা,

হয়েছ প্রৌঢ়—এই যা বদল। আমাদের কথা স্বতন্ত্র। যাক্ ও সব কথা। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

—কি কথা?

—তোমার পাশে কে বসেছিল?

—আমার স্ত্রী।

—তোমার আর কিছু না থাক, চোখ আছে। কতদিন বিয়ে করেছ?

—বিলেত থেকে ফিরেই, অল্পদিন পরে।

—আমাকে বিয়ে করলে না কেন?

—জানিনে। করলে কি হত?

—তোমার জীবন আরামের হত না। কিন্তু তোমার স্ত্রীর মত আমারও আজ রূপ থাকত, প্রাণ থাকত।

—কেন, তুমি ত যেমন ছিলে তেমনি আছ।

—তার কারণ তুমি ত আর আমাকে দেখতে পাচ্ছ না, দেখছ তোমার স্মৃতির ছবি।

—তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি নে।

—পারবে আমি চলে যাবার সময়।

—কখন চলে যাবে?

—ঐ সিগারেটের পরমায়ু যতক্ষণ, আমার মেয়াদও ততক্ষণ। ও যখন পুড়ে ছাই হবে, তোমার পূর্ব্বস্মৃতিও উড়ে যাবে। তখন দেখবে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর পরের প্রকৃত রূপ।

আমি জিজ্ঞেস করলুম,

—এ রূপ-পরিবর্ত্তনের কারণ কি ?

—আমি বহুরূপী।

—তা জানি, কিন্তু সে মনে। দেহেও কি তাই ?—আমি তোমার কথা বুঝতে পারছিনে।

—কবেই বা তুমি বুঝতে পেরেছ ? Prologue-এর রূপ আর epilogue-এর রূপ কি এক ? তা জীবন-নাটক comedyই হোক্ আর tragedyই হোক্।

—তোমার জীবন-নাটক এ দুয়ের মধ্যে কোনটি ?

—গোড়ায় comedy, আর শেষে tragedy।

—কথা কইবার ধরণ তোমার দেখ্‌ছি সমানই আছে।

—তুমি ত কখনো আমাকে ভালবাসনি। ভালবেসেছিলে আমার কথাকে। তাই তুমি আমাকে বিয়ে করোনি। পুরুষ-মানুষে মেয়ে-পুতুলকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু গ্রামোফোনকে নয় !

—আর তোমার কাছে আমি কি ছিলুম ?

—আমার খেলার সাথী।

—কোন্ খেলার ?

—ভালবাসা-বাসি পুতুল-খেলার। তুমি যখন বিলেত থেকে চলে এলে, তখন দুচারদিন দুঃখও হয়েছিল। পুতুল হারালে ছোট ছেলেমেয়েদের যেরকম দুঃখ হয়।

—তারপর আমার কথা ভুলে গিয়েছিলে ?

—হাঁ, ততদিন যতদিন জীবনটা comedy ছিল। আর

যখন তা tragedy হয়ে দাঁড়াল, তখন আমার মনে তুমি আবার ফিরে এলে।

—এর কারণ ?

—সুখে থাক্‌তে আমরা অনেক কথা ভুলে যাই। দুঃখে পড়লেই, পূর্ব্বসুখের কথা মনে পড়ে।

আমি বললুম, হেঁয়ালী ছাড়। ব্যাপার কি ঘটেছিল বলো।

সে উত্তর করলে,

—অত কথা বলবার আবশ্যক নেই। দুকথায় বলছি। তুমি চলে আসবার পরে আমিও বিবাহ করেছিলুম,—একটি ধনী ও মানী লোককে। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে আমি একটি পুতুল। পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে আমি স্ত্রীলোক হলেও মানুষ। আর আমিও আবিষ্কার করলুম যে তিনি পুরুষ হলেও সমাজের হাতে গড়া একটী পুতুল মাত্র। কাজেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। তার পর থেকেই সামাজিক ও সাংসারিক হিসেবে আমার অধঃপতন সুরু হল। তারপর দুঃখকষ্টের চরম সীমায় পৌঁছেছিলুম। আর সেই সময়েই তোমার স্মৃতি আবার জেগে উঠল, জ্বলে উঠল। এখন আমি সুখদুঃখের বাইরে চলে গিয়েছি। আবার যখন দেখা হবে সব কথা বলব।

—আবার দেখা কবে ও কোথায় হবে ?

—কবে হবে জানিনে। তবে কোথায় হবে জানি। আমি এখন যেখানে আছি, সেখানে। সে দেশে ঘড়ি নেই। কালের অঙ্ক সেখানে শূন্য—অর্থাৎ অনন্ত। সে হচ্ছে সুধু কথার দেশ।

এর পরে সে বললে—ঐ যে তোমার স্ত্রী তোমাকে খুঁজতে আস্‌ছে। আমি সরে পড়ি। এই কথা বলবার পরে, পুরাকালে সূর্পনখা যেমন এক মুহূর্ত্তে পরমা সুন্দরীর রূপ ত্যাগ করে ভীষণ রাক্ষসী মূর্ত্তি ধারণ করেছিল, সেও তেমনি নবরূপ ধারণ করে আমার সুমুখে দাঁড়াল। সেটি একটি জীর্ণাশীর্ণা বৃদ্ধা, পরণে তালিমারা ছেঁড়াখোঁড়া পোযাক। অথচ তার মুখে চোখে ছিল তার পূর্ব্বরূপের চিহ্ন। যদিচ তার চোখের রঙ এখন violet নয়,—ঘোলাটে, আর তার নাক Grecian নয়, ঝুলে পড়ে Roman হয়েছে। আমি অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে দেখছি, এমন সময় আমার স্ত্রী এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

—এখানে রোদে দাঁড়িয়ে কি করছ, তোমার না অসুখ করেছিল ?

আমি বললুম—একটা বুড়ী মেম আমাকে এসে জ্বালাতন করছিল ভিক্ষের জন্যে। এই মাত্র চলে গেল।

---কৈ আমি ত কাউকে দেখলুম না, বুড়ী কি ছুঁড়ী কোনও মেমকেও। সকাল থেকেই দেখ্‌ছি কেমন মনমরা হয়ে রয়েছ। সমস্ত রাত্রি ঘুমোও নি, তার উপরে এই দুপুর রোদে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছ। চল বাড়ী যাই, নইলে তোমার ভির্ম্মি লাগ্‌বে।

---যো হুকুম। চল যাই।

---ভাল কথা, আজ তোমার হয়েছে কি ?

---আজ আমার Merry Christmas।

ফার্ষ্ট ক্লাশ ভূত

আমরা তখন সবে কলকাতায় এসেছি, ইস্কুলে পড়তে। কলকাতার ইস্কুল যে মফঃস্বলের চাইতে ভাল, সে বিশ্বাসে নয়। কারণ ইস্কুল সব জায়গাতেই সমান। সবই এক ছাঁচে ঢালা। সব ইস্কুলই তেড়ে শিক্ষা দেয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউই শিক্ষিত হয় না; আর যদি কেউ হয়, তা নিজগুণে—শিক্ষা বা শিক্ষকের গুণে নয়। আমরা এসেছিলুম ম্যালেরিয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেতে।

আমরা আসবার মাস তিনেক পরে হঠাৎ সারদা দাদা এসে আমাদের অতিথি হলেন। সারদা দাদা কি হিসেবে আমার দাদা হতেন, তা আমি জানিনে। তিনি আমাদের জ্ঞাতি নন, কুটুম্বও নন, গ্রাম সম্বন্ধে ভাইও নন। তাঁর বাড়ী আমাদের গ্রামে নয়। দেশ তাঁর যেখানেই হোক, সেখানে তাঁর বাড়ী ছিল না। তিনি সংসারে ভেসে বেড়াতেন। আমাদের অঞ্চলে সেকালে উইয়ের ঢিবির মত দেদার জমিদারবাবু ছিলেন, আর তাঁদের সঙ্গে তাঁর একটা না একটা সম্পর্ক ছিল। সে সম্পর্ক যে কি, তাও কেউ জানত না; কিন্তু এর-ওর বাড়ীতে অতিথি হয়েই তিনি জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। আর সব জায়গাতেই তিনি আদরযত্ন পেতেন। তিনি একে ব্রাহ্মণ তার উপর কথায়বার্ত্তায় ও ব্যবহারে ছিলেন ভদ্রলোক। তাই তিনি দাদা হোন, মামা হোন, দূর-

সম্পর্কের শালা হোন, ভগ্নীপতি হোন—সকলেই তাঁকে অতিথি করতে প্রস্তুত ছিলেন। টাকা তিনি কারও কাছে চাইতেন না। তাঁর নাকি কাশীতে একটী বিধবা আত্মীয়া ছিলেন, আবশ্যক হলে তাঁর কাছ থেকেই টাকা পেতেন। সে মহিলাটীর নাম সুখদা। সুখদার নাকি ঢের টাকা ছিল, আর সন্তানাদি কিছু ছিল না। তাই সুখদার আপনার লোক বলে তাঁর মানও ছিল।

সারদা দাদার আগমনে আমরা ছেলেরা খুব খুশী হলুম, যদিও ইতিপূর্ব্বে তাঁকে কখন দেখিনি, তাঁর নামও শুনিনি। আমাদের মনে হল, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে বাঁচব। কলকাতায় আমাদের কোন আত্মীয়স্বজনও ছিল না, কোন বন্ধুবান্ধবও ছিল না, যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে সময় কাটানো যায়। আর ইস্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে গল্প করেও চমৎকৃত হতুম না, কারণ সেকালে কলকাত্তাই ছেলেদের কথাবার্ত্তার রস কলকাতার দুধের মতই ছিল নেহাৎ জলো।

সারদা দাদা রোজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের দেদার গল্প বলতেন ; জীবনে তিনি যা দেখেছেন, তারই গল্প। মা অবশ্য আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সারদা যা বলে তার ষোল আনাই মিথ্যে। কিন্তু তাতে আমরা ভড়কাইনি। কেননা মিথ্যা কথা আদালতে চলে না, কিন্তু গল্পে দিবারাত্র চলে। সে যাই হোক, সারদা দাদা বেশীর ভাগ ভূতের গল্প বলতেন। তবে সে কথা আমরা মার কাছে ফাঁস করিনি। শুনেছি বাবার একজন প্রিয় তামাকওয়ালা দাদার কাছে নিত্য ভূতের গল্প বলত, ফলে দাদা

নাকি রাত্তিরে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয় পেতেন। তারপর বাবা তাঁর প্রিয় তামাকওয়ালার আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে দিলেন। পাছে মা সারদা দাদাকে বিদায় করে দেন, এই ভয়ে মার কাছে এ গল্পসাহিত্যের আর পুনরাবৃত্তি করতুম না। তা ছাড়া কলকাতা সহরে ত ভূতের ভয় নেই। রাস্তায় আলো, পথের ধারে শুধু বাড়ী,—জঙ্গল নেই। ভূতেরা আলোকে ভয় করে, ও মানুষের চেঁচামেচিকে। কলকাতায় আলো যতটা না থাক, হল্লা দেদার আছে। অত হট্টগোলের মধ্যে ভূত আসেনা। সারদা দাদা শুধু সেই সব ভূতের গল্প বলতেন, যাঁদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—আপনি ত শুধু পাড়াগেঁয়ে ভূতের গল্প করেন, আপনি কি কখনো সাহেব ভূত দেখেন নি ?

সারদা-দা উত্তর করলেন—দেখ্‌বো কোত্থেকে ?—সাহেবরা ত আর এদেশে মরে না। না মরলে তারা ভূত হবে কি করে ? দেখো, ট্রেনে এত বড় বড় কলিসান হয়, যাতে হাজার হাজার দেশী লোক মরে ; কিন্তু তাতে কোন সাহেব মরেছে, এমন কথা কি কখনো শুনেছ ?

—তবে এত গোরস্থানে কারা পোঁতা আছে ?

সব ফিরিঙ্গি। তবে দুচারজন সাহেব যে মরে না, এমন কথা বলছিনে। কিন্তু যারা মরে ভূত হয়, তাদের দেখা আমরা পাইনে।

—কেন ?

—এদেশে তারা গাছেও থাকে না, পায়ে হেঁটেও বেড়ায় না। তারা ট্রেণের ফার্স্টক্লাশ গাড়ীতে চড়ে বেড়ায়। আর ফিরিঙ্গি ভূতরা সেকেণ্ডক্লাশ গাড়ীতে। তবে একবার একজনের দেখা পেয়েছিলুম, তা আর বলবার কথা নয়। আজও মনে হলে কান্না পায়।

—আমরা সেই সাহেব ভূতের গল্প শুনতে চাই।

সারদা-দা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—

আচ্ছা বলছি শোনো। কিন্তু এ গল্প যেন আর কাউকে বলো না।

—কেন ?

—কি জানি আবার যদি মানহানির মামলায় পড়ে যাই। মরা লোকেরও মানহানি করলে জরিমানা হয়, জেলও হয়। আবার জেল খাটতে আমার ইচ্ছে নেই। এর পর সারদা দাদা বললেন ঃ—

আমি একবার কলকাতা থেকে কাশী যাচ্ছিলুম। হাওড়া ষ্টেশনে যখন পৌছলুম, তখন গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। তাই একটা খালি ফাষ্টক্লাশ্ গাড়ীতে উঠে পড়লুম এই মনে করে যে, পরের ষ্টেশনে নেমে থার্ডক্লাশে ঢুক্‌ব। গাড়ীত ছাড়ল, অমনি বাথরুম থেকে একটি সাহেব বেরিয়ে এল। ঝাড়া সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, মুখ রক্তবর্ণ, চোখ গুগ্‌লির মত। আর তার সর্ব্বাঙ্গে বেজায় মদের গন্ধ বেরচ্ছে, আর সে বিলেতী মদের। সে ঘরে ঢুকেই বললে "কালা আদমী নীচু যাও !" আমার তখন ভয়ে

নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে, আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম "হুজুর আভি কিস্তরে নীচু যায়েগা ? দুসরা ষ্টেশনমে উতার যায়েঙ্গে।" তিনি বললেন—"ও নেহি হো সক্‌তা। তোমারা কাপড়া বহুত ময়লা আর তোমরা দেহ্‌ মে বহুত বদ্‌ বু। গোশলখানামে যাকে তোমরা কাপড়া উতারকে গোসল করো। আওর হুঁই বৈঠ্‌ রহো। হাম চলা যানেসে তুম গোসলখানাসে নিক্‌লিয়ো। হাম যো বোল্‌তা আভি করো, জান্‌তা হাম রেলকো বড়া সাহেব হ্যায় ?" আমি প্রাণের দায়ে হুজুর যা বললেন তাই করলুম। অর্থাৎ স্নানের ঘরে গিয়ে বিবস্ত্র হয়ে সেই শীতের রাত্তিরে স্নান করলুম। অমনি একটা দম্‌কা হাওয়া এসে আমার কাপড়চোপড় সব উড়িয়ে কোথায় নিয়ে গেল। আমি বিবস্ত্র হয়ে ভিজে গায়ে গোসলখানাতেই বসে রইলুম। আর সাহেব তাঁর কামরায় হুটোপাটি করতে লাগলেন ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে আমার প্রতি শুয়োর, গাধা, উল্লুক প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ করতে লাগলেন। আমি নীরবে সব গালিগালাজ হজম করলুম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এই ভাবে কেটে গেল। আমি ভিজে গায়ে হি হি করে কাঁপছি, সর্ব্বাঙ্গে এক টুকরো কাপড় নেই, আর পাশের ঘরে বড় সাহেব মদ খাচ্ছেন ও লাফাচ্ছেন।

মাঝপথে গাড়ী হঠাৎ মিনিটখানেকের জন্য থামল। ক্লিক্‌ করে একটা আওয়াজ হল—ছিট্‌কিনি খোলবার আওয়াজ। তারপর গাড়ী ফের চলতে লাগল। পাশের ঘরে টুঁ শব্দ নেই ; তাই আমি স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে সে ঘরে যাবার চেষ্টা

করলুম। ও সর্ব্বনাশ! বড় সাহেব স্নানের ঘরের দুয়োরের ছিট্‌কিনি টেনে বন্ধ করে দিয়েছেন। আমি সেই অন্ধ কূপের ভিতর আটক থাকলুম। আধঘণ্টা পর গাড়ী বর্দ্ধমানে এসে পৌঁছল। আর আমি বাথ্‌রুমের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, যা-থাকে কপালে ভেবে 'কুলি কুলি' বলে চীৎকার করতে লাগলুম। তারপর একজন কুলি এসে, ছিট্‌কিনি খুলে, আলো জেলে আমাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ভূত ভেবে ভয়ে পালিয়ে গেল। শেষটা ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু এসে—"ভূত নেহি হ্যায়, চোর হ্যায়" বলাতে কুলিরা পাশের ঘরে ঢুকে আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে প্ল্যাট্‌ফরমের উপর টেনে নিয়ে গেল।

ষ্টেশন বাবু বললেন, "শীগ্‌গির ওকে একটা কাপড় পরিয়ে দে। যদি কোন মেমসাহেব হঠাৎ এসে উলঙ্গমূর্ত্তি দেখে মূর্চ্ছা যান, তাহলে আমার চাকরি যাবে।" একজন যাত্রী আমাকে একটি সাড়ী দিলে, সেই সাড়ীখানি পরে আমি ষ্টেশন বাবুকে সব কথা বললুম। তিনি বললেন যে রেলের বড়-সাহেব এখন সিমলায়; তা ছাড়া এ ট্রেনে কোন সাহেব আসেওনি, কোথায়ও নেমেও যায়নি। এখন বুঝলুম যার হাতে আমি নাস্তানাবুদ হয়েছি, সে সাহেব নয়—সাহেবের ভূত। তারপর ষ্টেশন বাবু আমাকে থানায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও প্রথম একপত্তন মার হল, তারপর দারোগা বাবুর জেরা। যা ঘটেছিল, সব তাঁকেও বললুম। তিনি ভূতের কথায় বিশ্বাস করলেন, কেননা তিনিও একটি পেত্নীর হাতে পড়ে বেজায় নাজেহাল হয়েছিলেন।

তার পরদিনই দারোগাবাবু আমাকে আদালতে হাজির করলেন। আমার অপরাধ নাকি গুরুতর, আর অবিলম্বে আমার বিচার হওয়া চাই। হাকিমবাবু ছিলেন অতিশয় ভদ্রলোক, উপরন্তু উচ্চশিক্ষিত। তিনি গাড়ীতে ভূতের উপদ্রবের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি ছিলেন ঘোর থিয়োজফিষ্ট্। কিন্তু ভগবানের দোহাই ও ভূতের দোহাই ইংরেজের আদালতে চলে না। ভগবান ও ভূত এ দুয়ের অস্তিত্ব বে-আইনী। অগত্যা তিনি আমাকে এক মাসের মেয়াদে জেল দিলেন। আমার অপরাধ বিনা টিকিটে বিনা বসনে ফার্ষ্টক্লাশ গাড়ীতে গাঁজা খেয়ে ভ্রমণ। তারপর আমাকে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে—গাঁজা খাও ত খেয়ো; কিন্তু গাঁজায় দম দিয়ে আর কখনো বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ো না, বিশেষতঃ তৈলঙ্গস্বামী সেজে ফার্ষ্টক্লাশে ত নয়ই।

আমি বললুম—"হুজুর, গাঁজা আমি খাইনে।" তিনি বললেন, "গাঁজাখোর বলেই ত তোমাকে লঘুদণ্ড দিলুম, নইলে তোমাকে দায়রা সোপর্দ্দ করতুম।"

এখন তোমরা ফার্ষ্টক্লাশ ভূতের কথা ত শুনলে। এদের তুলনায় পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ঢের বেশি সভ্য।

স্বল্প-গল্প

এ গল্প আমি আমার আকৈশোর বন্ধু কুমার বাহাদুরের মুখে শুনেছি। যাঁকে আমি কুমারবাহাদুর বলছি, তিনি রাজপুত্র ছিলেন না; ছিলেন শুধু একটা পাড়াগেঁয়ে মধ্যবিত্ত জমিদারের একমাত্র সন্তান। তাঁর নাম ছিল কুমারেশ্বর, তাই কলেজে তাঁর সহপাঠীরা মজা করে' তাঁকে কুমার বাহাদুর বলে ডাকতেন। এই নামটাই আমাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

স্বধু কুমার নামটা কেমন নেড়া-নেড়া শোনায়—ওর পিছনে "বাহাদুর" লেজুড়টা জুড়ে দিলে নামটাও যেমন ভরাট হয়, কানও তেমনি সহজে তা' গ্রাহ্য করে; কেননা, কান তাতে অভ্যস্ত।

কুমারবাহাদুরও এই ডাকনামে কোন আপত্তি করেন নি। পড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা কে প্রত্যাখ্যান করে—বিশেষতঃ যে জিনিস দাম দিয়ে কিনতে হয়, তা' অম্নি পেলে কে না খুসি হয়?

যদিও তিনি জানতেন যে, ও নামের ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন খোঁচা আছে; যে খোঁচা—যাদের খেটে খেতে হবে তারা, যাদের তা' করতে হবে না তাদের গায়ে বিঁধিয়ে সুখ পায়। ও একরকম কথার চিম্‌টি কাটা।

কুমার বাহাদুরের sense of humour দিব্যি সজাগ ছিল, তাই তিনি ছোটখাটো অনেক কথা ও ব্যবহার—ঈষৎ বিরক্তি-কর হলেও ছোট বলেই হেসে উড়িয়ে দিতেন; যেমন আমরা

গায়ে মাছি বসলে, তাকে উড়িয়ে দিই। পরশ্রীকাতরতার উৎপাত মানুষমাত্রকেই উপেক্ষা করতে হয়, নইলে মানব-সমাজ হয়ে উঠত একটা যুদ্ধক্ষেত্র। বলা বাহুল্য শ্রী মানে স্বধু রূপ নয়, গুণও বটে; স্বধু লক্ষ্মী নয়, সরস্বতীও বটে।

তিনি B. A. পাস করবার পরে, অর্থাৎ কলেজ ছাড়ার পর বেশীর ভাগ সময় দেশেই বাস করতেন। পাড়াগাঁয়ে নাকি সময় দিব্যি কাটানো যায়;—শিকার করে ও বিলেতি নভেল পড়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পয়লা নম্বরের বন্দুক ও নভেল স্বধু বিলেতেই জন্মায়। সেই সঙ্গে জমিদারী তদারক করতেন। দেশে যখন ম্যালেরিয়া দেখা দিত, তখন তিনি তীর্থযাত্রা করতেন,—ঠাকুর দেখবার জন্য নয়, ঠাকুরবাড়ী দেখবার জন্য। দেবদেবীর ভক্ত তিনি ছিলেন না; ছিলেন architecture-এর অনুরক্ত। এও একরকম বিলেতি সখ। তাঁর জমিদারীর আয়ে এসব সখ সহজেই মেটাতে পারতেন। আর কলকাতায় যখন আসতেন, তখন আমার সঙ্গে দেখা করতেন। কেননা ইতিমধ্যে আমি হয়ে উঠে-ছিলুম তাঁর friend, philosopher and guide.

কিছুদিন পূর্ব্বে কুমার বাহাদুর হঠাৎ একদিন আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন যা কথাবার্ত্তা হল—তাই আজ বলছি। এই কথোপকথনকেই আমি পূর্ব্বে বলেছি—গল্প। কিন্তু তিনি যে ঘটনার উল্লেখ করলেন, আর যার নায়ক স্বয়ং তিনি, সে ঘটনা এতই অকিঞ্চিতকর যে, তা অবলম্বন করে একটি ছোট গল্পও গড়ে তোলা যায় না। তবে তিনি তাঁর মনের

গোপন কথা এত মন খুলে বলেছিলেন যে, আমার মনে সেটি গেঁথে গিয়েছে। কুমার বাহাদুর তুচ্ছ জিনিসকে উপেক্ষা করতেন, কিন্তু সেদিন দেখলুম তিনি একটি তুচ্ছ ঘটনাকে খুব বড় করে দেখেছেন, বোধহয় সেটি নিজের কীর্ত্তি বলেই।

আমি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলুম—

—কেমন আছ ?

—ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। শরীর ভাল কিন্তু মন খারাপ।

—মন খারাপ কিসে হল ?

—অর্থাভাবে।

—তোমার অর্থাভাব ?

—হাঁ, তাই। এখন থেকে আমাকে ভিক্ষে করে খেতে হবে—এই ভয়ে মনটা মুষ্‌ড়ে গিয়েছে।

—তোমাকে ভিক্ষা করতে হবে ?

—ভয় নেই ! তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসি নি। তুমি সাহিত্যিক, দেবে কোত্থেকে ?

—রসিকতা করছ ?

—না, আমি সত্যসত্যই প্রায় নিঃস্ব হয়েছি। এখন বেঁচে থাকতে হলে, পরের অনুগ্রহে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে ;— যার শ্রুতিকটু নাম হচ্ছে ভিক্ষে করা। যদিচ অনেকেই তা করে। কেউ করে সরকারের কাছে মান ভিক্ষা ; কেউ করে রমণীর কাছে প্রেম ভিক্ষা ; আবার কেউ করে গুরুর কাছে জ্ঞান ভিক্ষা।

আমি মনে করেছি বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে এখন থেকে করব মুষ্টিভিক্ষা।

—আচ্ছা তা যেন হল, তোমার সম্পত্তি কি সব উড়িয়ে দিয়েছ ?

— না, গরু এখনও গোয়ালে আছে, কিন্তু দুধ দেয় না।

অর্থাৎ জমিদারীর স্বত্ব আছে, কিন্তু উপস্বত্ব নেই।

—কারণ ?

---Economic depression।

---তাহলেও ত কর্জ্জ করতে পারো।

— কর্জ্জ দেয় ধনীলোকে, আর নেয় ধনীলোকে। ও একরকম স্থাবর সম্পত্তি ও অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে জুয়োখেলা। ভিক্ষে করে শুধু গরীব লোকে ; আর আমি এখন গরীব হয়েছি। সুতরাং ও জুয়োখেলায় যোগ দেবার আমার আর অধিকার নেই। যে সম্পত্তি আজ আছে, তা' হয়ত সদর খাজনার দায়ে কাল বিকিয়ে যাবে।---এমন সম্পত্তি রেহান রেখে কে কর্জ্জ দেবে ? আর তা ছাড়া মহাজনদের অবস্থাও তথৈবচ।

—তাহলে ধারও করতে পারবে না ?

না। কর্জ্জের পথ বন্ধ বলেই ত ভিক্ষের পথ ধরব মনে করছি। ইংরাজীতে একটা মহাবাক্য আছে--- Beg, borrow or steal.

---তাই বুঝি beg করাটাই শ্রেয় মনে করেছ ?

---উপায়ান্তর নেই বলে। যদিচ জানি তাতে বিশেষ কোনও

ফল হবে না। সামাজিক লোকের ভিতর fraternity নেই। Equalityও নেই, পরে হবে যখন তারা libertyতেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে। Dictatorরা মানুষকে লেশমাত্র liberty দেন না।

---তাহলে borrow করতে পারবে না, beg করেও কোনও ফল হবে না। তবে করবে কি ?

—Steal আমি করব না। জন্মের মধ্যে কর্ম্ম একবার করেছিলেম, তাতেই মনটা তিতো হয়ে রয়েছে।

—চুরি করেছিলে তুমি ?

—হাঁ। এখন সেই চুরির মামলা শোন।

(২)

আমি সেকালে একবার দার্জ্জিলিং যাচ্ছিলুম—পূজোর পর ; বোধহয় অক্টোবর মাসের শেষ হপ্তায়। পাগ্‌লা ঝোরার কাছে এসে দেখি, সে যেন বাস্তবিকই ক্ষেপেছে—লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে, গর্জ্জাচ্ছে—আর আমাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। শুনলুম ট্রেণ আর বেশী দূর এগোতে পারবে না। রেলের রাস্তা নাকি অতিবৃষ্টিতে খানিকটা ধ্বসে পড়েছে। এ গাড়ী ছেড়ে খানিকটা হেঁটে মহানদীতে গিয়ে অন্য গাড়ীতে উঠতে হবে। করতে হলও তাই। খানিকক্ষণ বাদে নামতে হল, তারপর জলকাদার ভিতর দিয়ে আধ মাইল পথ পদব্রজে উত্তীর্ণ হয়ে মহানদীতে এসে আর একটী খালি গাড়ীতে চড়লুম্। আমি একা নয়—সঙ্গে ছিল অনেক সাহেব মেম।

সে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখি জনৈক পল্টনী সাহেব আগে-ভাগে সেখানে অধিষ্ঠান হয়েছেন। এতে অবশ্য আমি খুসী হলুম না। মেমেরা যেমন কালা আদমীদের সঙ্গে এক গাড়ীতে উঠতে ভালবাসেন না—আমরাও তেমনি সাহেবসুবোদের সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতে আসোয়াস্তি বোধ করি। রঙের তফাতে যে মানুষে মানুষে কত তফাত হয়, তা ত তুমি জান। কিন্তু অগত্যা সেই গাড়ীতেই উঠে পড়লুম। সেটা ছিল ফার্ষ্ট ক্লাশ, আর আমার পকেটেও ছিল ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিট। এক পা কাদা নিয়ে ঢুকতে ঈষৎ ইতস্ততঃ করছিলুম। কিন্তু চোখে পড়ল যে সাহেবটীর পদযুগলও তদবস্থ। তাঁর পা আমার চাইতে ঢের বড়, জুতোও সেই মাপের ; সুতরাং কর্দ্দমাক্ত হয়েছে তদনুরূপ। ট্রেণে চড়ার পর মাঝপথে গাড়ী থেকে নেমে, কিছুদূর পায়ে হেঁটে, আবার নতুন গাড়ীতে চড়া কষ্টকর না হলেও বিরক্তিকর। আগের গাড়ীতে মালপত্র যেমন সুব্যবস্থিত থাকে, পরের গাড়ীতে ঠিক তা থাকে না : সবই ভেস্তে যায়। যা ছিল চড়বার গাড়ীতে, তা মালগাড়ীতে চলে যায় ; আর কোন কোন জিনিস মালগাড়ী থেকে বসবার গাড়ীতে বদলি হয়। এতেই মন খিঁচ্ড়ে যায়। ছোটখাটো অসুবিধে আসলে মস্ত বড় অসুবিধে। আমি মুখের ঘাম মুছতে আমার hand-bag থেকে একটি রুমাল বার করতে গিয়ে দেখি সেটি অদৃশ্য হয়েছে। তাই কি করি—ভিজে মুখ ভার করে বসে থাকলুম।. চারিপাশ কুয়াসার খদ্দরে ঢাকা ; তাই পাহাড়ের দৃশ্য আমার চোখে পড়ল না। যদিচ এই

পথটুকুর চেহারা অতি চমৎকার। রাস্তার দুধারে প্রকাণ্ড গাছ, যাদের একটিরও নাম জানিনে; অথচ দেখতে বড় ভাল লাগে। পৃথিবীতে অনেক জিনিসের নামই তার রূপ দেখ্‌তে দেয় না। কার্সিয়ং পৌঁছবার কথা বেলা এগারোটায়—কিন্তু বেলা একটা বেজে গেল, তখনও গাড়ী সে ষ্টেশনে পৌঁছল না। সেদিন ক্ষিধেও পেয়েছিল বেজায়। একে বেলা হয়েছে, তার উপর আধ মাইল কাদার মধ্যে পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়েছে। তাই কার্সিয়ং পৌঁছিয়েই ষ্টেশনের restaurantতে খেতে গেলুম। এক পেট মাছমাংস খেয়ে যখন গাড়ীতে ফিরে এলুম, তখন গাড়ী ছাড়বার বড় দেরি নেই। গাড়ীতে ফিরে এসে দেখি আমার cigarette caseএ একটিও cigarette নেই—ইতিমধ্যে সব ফুঁকে দিয়েছি। আর আমি restaurant থেকেও সিগারেট কিনিনি, কারণ আমি জানতুম আমার hand-bagএ একটা পুরো সিগারেটের টিন আছে। শুধু ভুলে গিয়েছিলুম যে—হ্যাণ্ডব্যাগটি হারিয়েছে। একটি সিগারেটের অভাবে আমার প্রাণ আই-ঢাই করতে লাগল। সিগারেটের নেশা গাঁজাগুলিচরসভাঙের মত নয়, কিন্তু নেশা মানে যদি মৌতাত হয়—তাহলে এ মৌতাত ইয়াদী। যদি মনে হল যে সিগারেট খাব, তখন তা না পেলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আশান। চোখে পড়ল সুমুখের বেঞ্চে সাহেবের একটি খোলা টিন আছে, আর সাহেব তখনও গাড়ীতে এসে ঢোকেন নি, restaurantতে বসে whiskey পান করছেন। এই সুযোগে আমি অনেক ইতস্ততঃ করে সাহেবের টিন থেকে

একটি সিগারেট চুরি করলুম। আর গাঁজার কল্কেয় গেঁজেল যে ভাবে দম দেয়, সেই ভাবে কসে' দম দিয়ে দু'চার টানে সিগারেটটি ফুঁকে দিলুম। তার কারণ সাহেব এসে যদি দেখেন যে সিগারেট খাচ্ছি, তাহলে হয়ত আমার চুরি বমাল ধরা পড়বে। যদিচ ধোঁয়া দেখে অথবা শুঁকে কেউ বলতে পারে না সিগারেটটি কার। কিন্তু অন্যায় কাজ করলে এমনি অনর্থক ভয় হয়। তা যে হয়, তা সেকালের লোকরাও জানতেন। মৃচ্ছকটিকে শর্ব্বিলক বসন্তসেনার গহনা চুরি করে এমনি অকারণ ভয় পেয়েছিল ; তার স্বগতোক্তি এই—স্বৈর্দোষৈ ভবতি হি শঙ্কিত মনুষ্যঃ। লোকে বলে চুরিবিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। ধরা পড়বার কোনও সম্ভাবনা না থাকলেও—চুরি করলে ভদ্রলোকের মনের শান্তিভঙ্গ হয়। সে যাই হোক্, আমি ধোঁয়ার শেষ ঢোক গিলেছি, এমন সময় সাহেবটি এসে তাঁর স্থান অধিকার করলেন। যখন তিনি খানাপিনা করে ফিরে এলেন, তখন দেখি তাঁর যে মুখ ছিল সাদা তা হয়েছে লাল—ক্রোধে নয়, মদে। তিনি ফিরে এসেই তাঁর টিন থেকে একটি সিগারেট বার করে ধরালেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন—"try one of mine; you may like it."

আমি তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বললুম যে, আমি নিজে থেকেই চা'ব মনে করেছিলুম।

—কেন ?

—আমার সিগারেটের টিন হারিয়ে গেছে—আর আমি বসে বসে আঙুল চুষ্‌ছি।

—কি সর্ব্বনাশ! দেও তোমার কেস্—আমি সেটি ভরে দিচ্ছি।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁর দান্ প্রসন্নমনে গ্রহণ করলুম।

গাড়ী দারজিলিংয়ের অভিমুখে রওনা হলে পর তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল—প্রধানতঃ দারজিলিংএর আবহাওয়ার বিষয়। কথায় কথায় শিকারের কথা এসে পড়ল। আমিও অকারণ পশুপক্ষী গুলি করে মারি শুনে, তিনি আমাকে তাঁর জাতভাই মনে করে মহা খাতির করতে লাগলেন। আর বল্লেন—তোমরা যদি সব শিকারী হয়ে ওঠ, তাহলে বাঙ্গালীরা আমাদের কাছে অত নগণ্য হয়ে থাক্‌বে না। আমি বললুম—তার আর সন্দেহ কি?—যদিচ মনে মনে তাঁর কথায় সায় দিলুম না।

আর একটু এগিয়ে দেখি যে, টুং ও সোনাদার মধ্যে রাস্তা এক জায়গায় ভেঙে গিয়েছিল, আর সদ্য মেরামত হয়েছে। তাই ট্রেণ পা টিপে টিপে চলতে আরম্ভ করলে। আগে ছুটেছিল ঘোড়ার মত, এখন তার হল গজেন্দ্রগমন। পাহাড়ী মেয়েরা দশবারো মণ ওজনের পাথর সব পিঠে ঝুলিয়ে অবলীলাক্রমে নিয়ে আসছে ও পথের ধারে জড় করছে—আর সেই সঙ্গে মহা ফূর্ত্তি ক'রে গান গাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে এদের এই

ব্যবহার দেখছি দেখে সাহেব বললেন—"এরা সব সিপাহিদের মা, বোন ও স্ত্রী। এদের হাড় এত মজবুত না হলে কি বেঁটেখাটো গুর্খারা এমন মজবুত সিপাহি হতে পারত?"

তারপর একটি সতেরো আঠারো বৎসরের পাহাড়ী মেয়ে গাড়ীর কাছে এসে বললে, "সাহাব, একঠো সিগারেট মাঙতা।" সাহেব তিলমাত্র দ্বিধা না করে তাকে একটি সিগারেট দিলেন। মেয়েটী অমনি আহ্লাদে হেসেই অস্থির।

তারপর সাহেব বললেন, "পাহাড়ীদের আর একটা মস্ত গুণ এই যে, এরা ছিঁচ্‌কে চোর নয়। আমি কার্সিয়ংয়ে গাড়ীতে একটা খোলা টিন রেখে গিয়েছিলুম এই ভরসায় যে, এরা তার একটিও ছোঁবে না। ছিঁচ্‌কে চুরিতে ওস্তাদ হচ্ছে উড়েরা—cowardএর জাত কিনা।"

কথাটা আমার মনে কাঁটার মত বিঁধল, কিন্তু আমি কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলুম না যে—আমিও ত তাই করেছি। বাধ্‌লো আমার self-respectএ, কিন্তু মনে মনে নিজের উপর ঘোর অভক্তি হয়ে গেল।

তারপর থেকেই মনস্থির করেছি যে, যদি beg করতে হয় তাও স্বীকার, কিন্তু steal আর প্রাণ থাক্‌তে করব না। চুরির সুবিধে এই যে, তা গোপনে করা যায়; আর beg করতে হয় প্রকাশ্যেই। শাস্ত্রে বলে, "ন গুপ্তিরনৃতং বিনা;"—এইত মুস্কিল। একবার চুরি করলে হাজারটা মিথ্যে কথা বলে তা গোপন রাখ্‌তে হয়। মিথ্যে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার ধাতে নেই—

এক মজা করে' ছাড়া। তাই এখন থেকে ভিক্ষে জিনিষটে এস্তমাল করব।

এই বলে তিনি একটু হেসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করলেন "সাহাব, একঠো সিগ্‌রেট মাঙতা।" আমিও একটু হেসে তাঁকে একটি সিগারেট দান করলুম।

তিনি তার নাম পড়ে বল্লেন—"না থাক্‌। যে সিগারেট একবার চুরি করে খেয়েছি, সেই সিগারেট আবার ভিক্ষে করে খাব না।"

এর পর তিনি নিজের পকেট থেকে সোনার উপর নীল মিনে-করা একটী জমকালো case বার করে একটী সিগারেট নিজে নিলেন, অপরটী আমাকে দিলেন এই বলে'---Take one of mine, you may like it। আমি সেটি নিয়ে তাঁর caseটার উপর নজর দিচ্চি লক্ষ্য করে তিনি বললেন "এটি আমি বেচব না, জমিদারী বিকিয়ে গেলেও যোগ্য পাত্রে দান করব—অর্থাৎ সেই লোককে, যে ওটী ব্যবহার করবে না, শুধু বাক্সে বন্ধ করে রাখবে।" এই কথার পর তিনি নিজের সিগারেটটি ধরিয়ে গাত্রোত্থান করলেন। আমি বুঝতে পারলুম না তাঁর গল্পটি সত্য না বানানো। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে, কুমার বাহাদুর যদি ফকিরও হন, ভিখারী তিনি কখনো হতে পারবেন না, অমন দুগ্ধপোষ্য মন নিয়ে।

প্রগতি রহস্য

(১)

আজ যা পাঁচজনকে শোনাতে বসেছি, তা একটা উড়ো গল্প নয়; আমাদের বর্ত্তমান প্রগতির আংশিক ইতিহাস, অথবা দুটী ভদ্রলোকের আংশিক জীবনচরিত। এ দুই ব্যক্তির কেউ অবশ্য চিরস্মরণীয় নন। আমার স্মৃতিপটে এঁদের যে রূপ অঙ্কিত আছে, সেই ছবি ঈষৎ enlarge ক'রে আপনাদের সুমুখে খাড়া করতে চাই; যদিচ তাঁরা কেউ সুদৃশ্য ছিলেন না।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, এ কথা স্মরণ করিয়ে দেবার স্বার্থকতা কি?—আমার উত্তর হচ্ছে, আমাদের ভিতর ক'জন চিরস্মরণীয় হবেন?—দু'এক জনের বেশী নয়। তাই বলে আমরা যারা আছি, আমাদের মতামতের ও বিদ্যাবুদ্ধির কি কোন মূল্য নেই? আমাদের মত সাধারণ লোকের সঙ্গে অসাধারণ লোকের প্রধান তফাৎ এই যে, আমরা আছি, আর তাঁরা ছিলেন। যখন তাঁরা ছিলেন, তখন তাঁরা আমাদেরই মত কাউকে হাসিয়েছেন, কাউকে কাঁদিয়েছেন, কাউকে ঘুঁসো দেখিয়েছেন, কারও কাছে জোড়হাত করেছেন। অর্থাৎ আমরা আজ যা করি, বছর পঞ্চাশ আগে তাঁরাও তাই করেছেন। আমরা কেউ কেউ সেকালের কথা শুনতে যে ভালবাসি তার

কারণ, একাল সেকালেরই পুনরুক্তি মাত্র। আমাদের প্রতি ব্যক্তির যেমন একটু আধটু বিশেষত্ব আছে, তাঁদেরও তেমনি ছিল। সেই বিশেষত্বই আমার মনে আছে, আর সেই কথা আপনাদের নিবেদন করতে চাই। কি সূত্রে এঁদের কথা আজ মনে পড়ে গেল, তা বলছি।

(২)

প্রগতি যে আমাদের হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রগতির মানে কি?—কোনও বড় জিনিষের কোনও ছোট অর্থ নেই, যা দু'কথায় বোঝানো যায়; আর অনেক কথায় তার ব্যাখ্যা করতে গেলে, লোকে সে কথায় কর্ণপাত করবে না। প্রগতির প্রমাণ এই যে, আমি যদি বলি প্রগতি হয় নি, তবে লোকে বলবে—তুমি অন্ধ, আর না হয়ত তুমি সেকেলে কুপমণ্ডুক। দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে, আমাদের কাব্যে ও চিত্রে, নৃত্যে ও গীতে কি পর্য্যন্ত প্রগতি হয়েছে ও হচ্ছে? তুমি প্রমথ চৌধুরী দেখ্‌ছ যে, আমরা আজও পরাধীন ও পরবশ;—কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে, আমাদের পরাধীনতাই আমাদের সকল প্রগতির মূল, আর তুমিও ঐ প্রগতির জোয়ারে খড়কুটোর মত ভেসে চলেছ।

আমি বলি—তথাস্তু। এখন জিজ্ঞাসা করি, দেশে প্রগতি আনলে কে?—যদি বল ইংরেজ, তাহ'লে কথাটা ঠিক হবে না। ইংরেজ ত আমাদের প্রগতির পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে India Act-এর বেড়া তুলে! এর পর আমাদের প্রগতির উল্টোরথ টানতে হবে।

তবে কি রামমোহন রায় এই প্রগতির রথ নূতন পথে চালিয়েছেন ?—অবশ্য এ পথ রামমোহন প্রথম আবিষ্কার করেন। তার পর বহু লোক এই রথের দড়ি টেনেছেন। এই শ্রেণীর দু'টি লোকের কথা তোমাদের শোনাব ; তার মধ্যে একজন ছিলেন প্রগতির নীরব কর্ম্মী আর একজন নীরব ভাবুক।

(৩)

আমি ছেলেবেলায় একটা মফঃস্বলের সহরে বাস করতুম, লেখাপড়া করবার জন্য। সেকালে উক্ত সহরে দু'জন গণ্যমান্য মুখুয্যে মহাশয় ছিলেন। একজনের ছিল অগাধ টাকা, আর একজনের ছিল অগাধ বিদ্যে—দুইই স্বোপার্জ্জিত ; কেন না, উভয়েই ছিলেন দরিদ্র সন্তান, কিন্তু উভয়েই self-help-এর মন্ত্র সাধন ক'রে একজন হয়েছিলেন ধনী, অপরটি বিদ্বান্।

কেনারাম মুখুয্যে কোন জমিদারের মেয়ে বিয়ে করে, তাঁর শ্বশুরকুলের দত্ত মাসহারার টাকা বাঁচিয়ে, সে উদ্বৃত্ত টাকা সুদে খাটাতেন। আমি এ কথা জানতুম এই সূত্রে যে, আমাদের মত লোকের অর্থাৎ যাদের আয়ের চাইতে ব্যয় বেশী, তাদের দরকার হলেই তিনি তিন চার হাজার টাকা অপব্যয় করবার জন্য ধার দিতেন, শতকরা বারো টাকা সুদে।

সে সহরে আর একটি ভদ্রলোক ছিলেন, যিনি জাতে সুবর্ণবণিক ও ধর্ম্মে খৃষ্টান। তাঁর স্ত্রী তাঁর ঘর আলো করে থাকৃত, আর তার নাম ছিল—My dear। তাঁর কোন ostensible means of livelihood ছিল না, অথচ টাকার কোনও অভাব

ছিল না। ছোট ছেলের কৌতূহলের অন্ত নেই—তাই আমি My dear-এর স্বামীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি যে, শ্রীযুক্ত কেনারাম মুখুয্যে এত টাকা করলেন কি ক'রে ?—তিনি বললেন যে, টাকা করা একটা আলাহিদা বিদ্যে। সে বিদ্যে যে জানে, সে বিনে পয়সায় দেদার পয়সা করতে পারে। পরে শুনেছি, তিনি আগে গভর্ণমেণ্টের চাকরী করতেন, কিন্তু অফিসে self-help-এর বিদ্যের এতটা বেপরোয়াভাবে চর্চ্চা করেছিলেন যে, সরকার তাঁকে কর্ম্ম-চ্যুত করতে বাধ্য হন ; জেলে দেননি পাদরি সাহেবের খাতিরে। তিনি ছিলেন প্রগতির একটি উপসর্গ। কি হিসেবে, তা পরে বলব।

(৪)

কেনারাম বাবু বোধহয় কখনো ইস্কুলকলেজে পড়েন নি। তিনি ইংরেজি জানতেন কি না, বলতে পারি নে। যদিও জান-তেন ত সে নামমাত্র। এ ধারণা আমার কোত্থেকে হ'ল, তা বলছি।

মুখুয্যে-গৃহিণীর একটি ছোটখাটো operation হবার কথা ছিল। ছুরি চালাবেন একটি লালমুখো গোরা ডাক্তার। Operationএর ফলাফল জানতে আমরা তাঁর বাড়ী উপস্থিত হয়ে দেখি, মুখুয্যে মহাশয় বারান্দায় পাগলের মত ছুটোছুটি করছেন ও বলছেন 'হরিবোল', 'হরিবোল'। আমরা এ কথা শুনে বুঝলুম যে, মুখুয্যে-গিন্নির কর্ম্ম সাবাড় হয়েছে।

তারপরে তাঁর একটি আশ্রিত আত্মীয় বললেন যে,

operation খুব ভালয় ভালয় হয়ে গিয়েছে। আমরা সেই কথা শুনে জিজ্ঞেস করলুম যে, মুখুয্যে মহাশয় তবে "হরিবোল" "হরিবোল" এই মারাত্মক ধ্বনি করছেন কেন ?—তিনি হেসে বললেন, উনি ইংরেজী বলছেন। কাটাকুটি ব্যাপারটা যে 'horrible'—তাই বলতে চেষ্টা করছেন !

এর থেকেই তাঁর ইংরেজি বিদ্যের বহর বুঝতে পারবেন। তিনি যে আমাদের নব প্রগতিকে মনে মনে গ্রাহ্য করেছিলেন, সে ইংরেজি পড়ে নয়, লোকচরিত্র দেখেশুনে। তাঁর মতামত এখন উল্লেখ করছি।

আমার যখন বয়স বছর বারো, তখন কেনারাম বাবু আমাকে একদিন বলেন যে, আমাদের এ দেশে উন্নতি কোন জিনিষে এনেছে জানো ?—আমি বললুম "না"।

তিনি বললেন Brandy। Brandy না খেলে মুরগী খাওয়া যায় না, আর মুরগীর পিঠপিঠ আসে আর সব প্রগতি। Brandy পান করলে নেশা হয়, অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়। তখন মুরগী নির্ভয়ে খাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের জাতিভেদ থাকে না। মুরগী খেতে হলেই মুসলমানের হাতে খেতে হয়। তারপরেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কেন না, অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা ওরূপ পান-ভোজনে মহা আপত্তি করে; শিক্ষিত হ'লে করে না। আর স্ত্রী-শিক্ষার পিঠপিঠ আসে স্ত্রী-স্বাধীনতা। তারা লেখাপড়া শিখবে অথচ অন্দরমহলে আটকে থাকবে,—এ হতেই পারে না। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ

প্রগতির মূল হচ্ছে Brandy, ইংরেজী শিক্ষা নয়। ইংরেজী শেখা শক্ত, কিন্তু Brandy গেলা খুব সহজ। এ বিষয়ে অশিক্ষিত-পটুত্ব কি লোকের দেখনি ?—এই কারণে আমি Brandy-খোরদের উৎসাহ দিই। ঐ নেশার পথই হচ্ছে যথার্থ প্রগতির পথ। যদিও আমি নিজে মদও খাইনে, মাংসও খাইনে।

খৃষ্টান ভদ্রলোকটি এঁর সাহায্য করতেন, কারণ তাঁর ওখানে গেলেই তিনি চায়ের সঙ্গে মুরগীর ডিম অর্থাৎ প্রগতির ডিম সকলকেই খাওয়াতেন !

(৫)

পূর্ব্বে বলেছি মুখুয্যে মহাশয়দ্বয়ের ছবি আঁকবার যোগ্য নয়। এঁদের কেউই রূপে শ্রীকৃষ্ণ বা মহাদেব ছিলেন না। দুজনেই রঙ ও রূপে ছিলেন আমাদের মতই সাধারণ বাঙ্গালী। শুধু বাঞ্ছারাম বাবুর কোনও অঙ্গ ছিল অসাধারণ সঙ্কুচিত, কোন অঙ্গ আবার তেমনি প্রসারিত। তাঁর চোখ দুটি ছিল অযথা সঙ্কুচিত আর নাসিকা বেজায় প্রসারিত। আর তাঁর চুল ছিল ঊর্দ্ধমুখী। সে চুলের ভিতর চিরুণিব্রুসের প্রবেশ নিষেধ, আর গুম্ফ ঐ একই উপাদানে গঠিত। আর তাঁর উদরের আয়তন ছিল অসাধারণ প্রবৃদ্ধ। লোকে বলত তাঁর পেটের ভিতর একখানা গোটা Webster's Dictionary বাসা বেঁধেছে। এ রসিকতার অর্থ—তিনি নাকি A থেকে Z পর্য্যন্ত সমস্ত ইংরেজী শব্দ উদরস্থ করেছেন। এক কথায়, তাঁর চেহারা ছিল ঈষৎ ভীতিপ্রদ।

কিন্তু আমরা ছেলের দল তাঁকে ভয় করতুম না, করতেন

আমাদের মাষ্টার মহাশয়রা। কেননা, তিনি ছিলেন সেকালের একজন জবরদস্ত School Inspector। তিনি পরীক্ষা করতেন আমাদের, কিন্তু আমাদের ভুলভ্রান্তির জন্য শাস্তি দিতেন মাষ্টার মহাশয়দের। কাউকে করতেন বরখাস্ত, কাউকে করতেন জরিমানা। কারণ তাঁর কথা ছিল—ছেলেরা যদি ভুল ইংরেজী লেখে ত' জাতির প্রগতি হবে কোত্থেকে?—প্রগতি অর্থে তিনি বুঝতেন,—ইংরেজী ভাষার ষত্ব-ণত্বের জ্ঞান। তাঁর তুল্য ইংরেজী যে ইংরেজরাও জানে না, এই ছিল লোকমত।

(৬)

তাঁর ইংরেজী জ্ঞানের একটা নমুনা দিই। আমাদের সহরের গভর্ণমেণ্টের একটি বৃত্তিভোগী স্কুলের second কেলাসের ছাত্রদের তিনি মুখে মুখে পরীক্ষা করছিলেন। সে সময়ে পড়ানো হচ্ছিল Psalm of Life নামক একটী কবিতা। ছেলেদের মুখে psalm pasalamaয় রূপান্তরিত হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—এ উচ্চারণ তোমাদের কে শিখিয়েছে? ছেলেরা উত্তর করলে—মাষ্টার মহাশয়! বহু ব্যঞ্জনবর্ণ পাশাপাশি থাক্‌লে, উহ্য স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণের সময় জুড়ে দিতে হবে। সেইজন্য আমরা তিনটী অলিখিত a ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়েছি। বাঞ্ছারাম বাবু বল্‌লেন,—তিনটী vowel না জুড়ে দুটী ব্যঞ্জনবর্ণ ছেঁটে দিতে পারতে, তাহলেই ত উচ্চারণ ঠিক হ'ত। এটী মনে রেখো যে, ইংরেজরা লেখে এক, বলে আলাদা, এবং করেও আলাদা। এই হচ্ছে তাদের অভ্যুদয়ের কারণ।

এর পর second masterকে তিনি থার্ড মাষ্টার করে দিলেন। লোকে বলে, সেকেণ্ড মাষ্টার ব্রাহ্ম ব'লে তাঁর এই শাস্তি হ'ল। মাষ্টার মহাশয় যে ঘোর ব্রাহ্ম ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই,—কেননা, তিনি তাঁর মেয়ের বিয়েতে শালগ্রামের বদলে একটা তামাকের ডেলা সাক্ষী রেখে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেছিলেন। অপরপক্ষে বাঞ্ছারাম বাবু ছিলেন একাধারে ঘোর নাস্তিক এবং হিন্দু। ব্রাহ্মদের তিনি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারতেন না; কেননা তাঁরা হিন্দুয়ানীর বিরোধী ও ভগবানে বিশ্বাস করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম হচ্ছে—ইংরেজী না জানার ফল। তাঁর মতে এ ধর্ম্ম হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাস্‌তুতো ভাই।

(৭)

যাঁরা মনে করেন যে, ইংরেজী না জানলে লোকে সভ্য হয় না, তাঁদের বলি যে, একথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে বাঞ্ছারাম বাবু ছিলেন আমাদের প্রগতির একটি অগ্রদূত।

তিনি মরবার সময়ও ইংরেজী বলতে বলতে মরেছেন। ইংরেজী শিক্ষার ফলে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। ডাক্তাররা বললে যে, রোগের একমাত্র ঔষধ ব্রাণ্ডি, ও পথ্য মুরগীর মাংস। নিরামিষাশী বাঞ্ছারাম বাবু এ ওষুধপথ্য সেবনে কিছুতেই রাজী হলেন না। তিনি বললেন To be, or not to be, that is the question। সেক্সপিয়ারের এ-প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তার কথা হচ্ছে—We are such

stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.

তারপর তাঁর যখন আসন্নকাল উপস্থিত হ'ল, তখন তাঁর ইংরেজীনবীশ উকীল ডাক্তার বন্ধুরা সব বাড়ীতে উপস্থিত হন। বড় ডাক্তার বাবু এসে দেখলেন, সকলের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তিনি রোগীর নাড়ী টীপে বললেন—My eyeballs burn and throb, but have no tears-এ কথা শুনে মুমূর্ষু রোগী বললেন—Long live Byron। এর পরেই তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।—এখন আমরা যখন প্রগতির উল্টো রথ টানতে বাধ্য হব, তখন পূর্ব্ব-প্রগতির কোন্ ধারা বজায় থাক্‌বে? কেনারাম বাবুর অনুমত পানভোজন?—না বাঞ্ছারাম বাবুর অভিমত ইংরেজী ভাষা? যে ভাষার লেখার সঙ্গে বলা মেলে না, আর বলার সঙ্গে করা মেলে না।